তাঁর মৃত্যুতে আমাদের কবিতায় একটি যুগের অবসান হলো

কালের আয়নায়

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

কবিরা সম্ভবত শুধু পোয়েট নন, প্রোফেটও। তা না হলে তারা কেমন করে এমন সব কথা বলেন যা অনেক সময় অমোঘ সত্য হয়ে যায়! এমনকি নিজেদের মৃত্যু সম্পর্কে তাদের অনেকের প্রোফেসি খেটে যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে।" সাঁঝবেলায় তার মৃত্যু হয়নি। কিন্তু ব্যাকুল বাদলের মাসেই (২২ শ্রাবণ) তার মৃত্যু হয়েছিল। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন আরো কঠোর সত্য। তার একটি কবিতায় একটি পঙ্‌ক্তি হলো– "দেখে যাব জীবনের লাশকাটা ঘর।" ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয় এবং লাশকাটা ঘরেই তার মৃতদেহ প্রথম রাখা হয়েছিল।

কবি শামসুর রহমানের কি নিজের মৃত্যু সম্পর্কে এমন কোনো ভবিষ্যদ্বাণী ছিল? সরাসরি নেই। কিন্তু পরোক্ষভাবে আছে। বহুকাল আগে মাসিক সওগাত পত্রিকায় তার একটি চমৎকার কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ছিল– "গোধূলিতে হলো যার প্রয়াণ হে প্রভু...।" লন্ডনে বসে তার মৃত্যু খবরটি যখন পেলাম, তখন জানতে পারলাম ১৭ আগস্ট তারিখে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে তার জীবন-দীপ নিভে গেছে। আর তখনই আমার মনে পড়েছে কবির একটি কবিতার ওই লাইনটি– "গোধূলিতে হলো যার প্রয়াণ হে প্রভু...।" শোকের মধ্যেও তার কবিতা আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

মাত্র সাতাত্তর কি আটাত্তর বছর বয়সে বাংলাদেশের প্রধান কবি প্রয়াত হলেন। আমার আশা ছিল, তিনি অন্তত আশি পেরুবেন। শওকত ওসমান আশি পেরিয়ে সম্ভবত বিরাশি বছর বয়সে মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "আর কোনো ব্যাপারে না পারি, একটা ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে হারিয়ে দিলাম। তিনি একাশি বছর বয়সে মারা গেছেন, আমি যাচ্ছি বিরাশি বছর বয়সে।"

শামসুর রাহমানের গভীর জীবন-তৃষ্ণা, যাকে বলা হয় যঁঃ ভড়ৎ ঘরভব ছিল। আরেকবার যখন অসুস্থতার দরুন তার জীবন সংশয় দেখা দিয়েছিল, তখন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং প্রচুর অর্থ ব্যয়ে সিঙ্গাপুরে তার চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তার আরোগ্য লাভে আনন্দিত হয়ে অভিনন্দন জানানোর জন্য ঢাকায় তার বাসায় টেলিফোন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "গাফ্‌ফার, আমি আরো দীর্ঘকাল বাঁচতে চাই। যদিও রোগ-ব্যাধিতে আমার শরীরটা জর্জরিত। কিন্তু জীবন-তৃষ্ণা মেটেনি।"

শামসুর রাহমান সেদিন আন্তরিকভাবেই তার মনের ইচ্ছাটা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার প্রাক-যৌবন থেকে তাঁকে চিনি। জীবনের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি চাঁদ-ফুল-পাখি-নারী সবকিছু গভীরভাবে ভালোবাসতেন। তিনি প্রৌঢ় বয়সেও বলতেন, "আমি একটি সুন্দর ফুল দেখলে যতটা খুশি হই, ততটা খুশি হই একজন সুন্দরী নারী দেখলে।" এ সম্পর্কে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি রয়েছে নিজের স্মৃতিকথায়। এ লেখাটা দৈনিক জনকণ্ঠে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে কি-না তা এখনো জানি না।

শামসুর রাহমান চাঁদ-ফুল-পাখি আর নারী নিয়ে কবিতা লিখতেন। অনেকেই বলতেন তিনি নির্জনতার কবি, রোমান্টিক কবি। জীবনানন্দ দাশের মতো তার মধ্যে প্রকৃতিপ্রেম এবং নারীপ্রেম দুই-ই প্রবল ছিল। কবিতা চর্চার শুরুতে তিনি প্রবলভাবে জীবনানন্দ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তিনি সেই প্রভাব-বলয় থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মধ্যবয়সের আগেই নিজের প্রভাব-বলয় তৈরিতে সক্ষম হন। তিনি নির্জনতার ব্যূহবন্দি হয়ে থাকেননি, জনতার দিকেও মুখ ফিরিয়েছেন। লিখেছেন, "চাঁদ ফুল পাখি নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছি, মানুষের কথা কখনো ভাবিনি।" কিন্তু মানুষের কথাও তিনি ভেবেছেন।

সম্ভবত এই কবিতাটিরই শিরোনাম ছিল 'কোনো এক নিমগ্ন শহরকে'। ১৯৫০ অথবা ১৯৫১ সালের দিকে ঢাকায় 'অগত্যা' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'অগত্যা' ছিল ঢাকার তখনকার ইয়ংটার্কদের পত্রিকা। প্রচ্ছন্নভাবে এস্টাব্লিসমেন্টবিরোধী। এই কাগজ তখন আগুনের ফুলকি। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কষাঘাতে সমাজকে তীব্রভাবে নাড়া দিচ্ছে। এই কাগজে সে সময় মুগ্ধ হয়ে পড়ি তখনকার উঠতি লেখক মুস্তফা নূরুল ইসলামের 'ভান্টু উবাচ'। মাহবুব জামাল জাহেদীর তীব্র-তীক্ষ্ণ ভাষায় লেখা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। একটা গল্পের বই (জেগে আছি) প্রকাশ করেই দুই বাংলাতে সাড়া জাগিয়েছেন, সেই তরুণ কথাশিল্পী আলাউদ্দীন আল আজাদের গল্প। সেই সঙ্গে যুক্ত হলো শামসুর রাহমানের কবিতা পাঠের রোমাঞ্চ।

সত্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সাহিত্য সভায় অন্য আরেকজনের কণ্ঠে শামসুর রাহমানের কবিতা পাঠ শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। 'কোনো এক নিমগ্ন শহরকে' কবিতাটিরই পাঠ শুনেছিলাম সেদিন। ১৯৫০ সাল। আমি তখন ঢাকা কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। মফস্বল শহর থেকে মাত্র এসেছি। তবে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর এবং রেজাল্ট বেরুবার আগে যে দু'তিন মাস ছুটির মতোন থাকে, সেই ছুটিতে, সেই বছরেই একবার ঢাকায় বেড়াতে এসেছিলাম। তখন আমি আলাউদ্দীন আল আজাদের গল্পের ভক্ত পাঠক। আজাদই আমাকে জানালেন, কলকাতা থেকে বুদ্ধদেব বসু কয়েকদিনের জন্য ঢাকাতে বেড়াতে আসছেন। সেদিনই কায়েতটুলিতে এক ক্লাব ঘরে তার সঙ্গে তরুণ লেখকরা মিলিত হবেন। আমি ইচ্ছে করলে আজাদের সঙ্গে যেতে পারি। আমি সাগ্রহে রাজি হয়েছিলাম।

এই সভাতেই শুধু বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে দেখা হলো না; পরিচয় হলো ঢাকার তখনকার প্রগতিশীল তরুণ লেখকদের সঙ্গে। আজাদই পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাদের মধ্যে কবি আশরাফ সিদ্দিকীর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ছিল। প্রথম পরিচয় হলো শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আবদুর রশীদ খান, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর এবং আরো অনেকের সঙ্গে। বোরহানও তখন আমার মতো ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ঝাঁকড়া চুল, আয়ত চোখ, মাঝারি গড়নের শামসুর রাহমানকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে আমার ভালো লেগেছিল। আর দশজনের মধ্যে শামসুর রাহমানকে অনায়াসে একজন

হিসেবে বাছাই করা যায়। প্রতিভার ছাপও ছিল তাঁর চোখে-মুখে। সেই যে তাঁকে এবং তাঁর কবিতাকে ভালো লেগেছিল তা আর কোনোদিন মুছে যায়নি। বন্ধুত্ব দিন দিন গাঢ় হয়েছে। বিস্ময়ের কথা, তাঁর সঙ্গে আমার মতান্তর হয়েছে; কিন্তু মনান্তর হয়নি কোনোদিন, অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গেই যা হয়েছে।

তখন 'নতুন কবিতা'র যুগ। বাংলা ভাগ হওয়ার পর ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যের নতুন হাওয়া বইছে। এই হাওয়া কোন্ দিকে বইবে? সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা ও মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার দিকে, না বাঙালির অসাম্প্রদায়িক অখণ্ড সাংস্কৃতিক সত্তা এবং প্রগতিশীল ভবিষ্যতের দিকে? প্রবীণ সাহিত্যিকরা অনেকেই প্রথম দিকটির দিকেই মুখ ঘুরিয়ে রইলেন। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ভাষায়, উর্দু ও ফার্সির ছুরিতে জবাই করতে চাইলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে। অন্যদিকে তরুণরা সাহসের সঙ্গে মুখ ঘোরালেন প্রগতিশীল ভবিষ্যতের দিকে। আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খানের সম্পাদনায় তখন নতুন ও তরুণ কবিদের কবিতা সংকলন 'নতুন কবিতা' বেরিয়েছে। তাতে সর্বকনিষ্ঠ কবি ছিলেন বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। সব কবির কবিতাতেই বাংলা ভাষার নতুন জীবন-সংবাদ ঘোষিত হয়েছিল। এ যেন বাঙালি মুসলমানের বাঙালি হিসেবে আত্মচেতনার প্রথম বলিষ্ঠ উদ্বোধন।

এই কবিতা সংকলনে দু'জন কবির কবিতা ছিল পরস্পরকে নিবেদিত। তখনই জানলাম, শামসুর রাহমান এবং হাসান হাফিজুর রহমান পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দু'জনেই কবি এবং এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে তাঁর কবিতা উৎসর্গ করেছেন। তবে দু'জনের কবিতার স্বাতন্ত্র্য তখনই আমার চোখে পড়েছিল। হাসান হাফিজুর রহমান উচ্চকণ্ঠ এবং এককেন্দ্রিক দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেন। শামসুর রাহমান বাস্তবতাবিমুখ নন। কিন্তু জীবনের অনেক গভীরে তলিয়ে গিয়ে নিঃসঙ্গ হৃদয়গ্রাহী আলাপে মগ্ন থাকতে চান।

ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ভাগ হওয়ার পর প্রশ্ন উঠেছিল সেই একই ভিত্তিতে বাংলাভাষা, সংস্কৃতিও ভাগ হবে কি-না! একদল প্রবীণ বুদ্ধিজীবী ও কবি-সাহিত্যিক তা চেয়েছিলেন। এমনকি রবীন্দ্রসাহিত্য বর্জন এবং নজরুলের কবিতাকেও ছাঁটাই-বাছাই করার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। তাদের এ কাজে প্রকাশ্যে মদদ জোগাচ্ছিল পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকরা। এই প্রবীণ বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের কেউ কেউ চর্যাপদ থেকে রবীন্দ্র-নজরুল পর্যন্ত প্রসারিত বাংলাভাষা সাহিত্যকে হিঁদুয়ানি ভাষাসাহিত্য আখ্যা দিয়ে উর্দু-ফার্সি-বহুল বাংলা বা মুসলমানি বাংলা প্রচলনের ধুয়া তুলেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোরও সমর্থন ছিল এই প্রবীণদের পক্ষে।

এই সময় ঢাকায় 'অগত্যা', চট্টগ্রামে 'সীমান্ত' এবং সিলেটে 'নওবেলাল' প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নতুন এবং তরুণ কবি-সাহিত্যিকরা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার লড়াইয়ে না নামতেন, তাহলে তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য কী দুর্দিন ঘনাতো তা এখন কল্পনাও করা যায় না। হয়তো বাংলাভাষার নাম হতো বাংলা জবান এবং উর্দু বা ফার্সি হরফে বাংলা লেখার জন্য বাংলাদেশের মানুষকে বাধ্য করা হতো। পাকিস্তান সরকারের এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের পতাকা তোলেন ছাত্রসমাজ– বিশেষ করে তরুণ সাহিত্যিক সম্প্রদায়। শামসুর রাহমান তাদের অন্যতম।

এটা কাকতালীয় ব্যাপার কি-না জানি না, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি শামসুর রাহমানের কবিতাতেও প্রথম ভাষা বিদ্রোহের পতাকা উড়তে দেখা গেল। শামসুর রাহমান রাজনীতি-মনস্ক কবি ছিলেন না। ছিলেন নির্জন ভুবনের আনন্দ-বেদনার কবি; কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা গেল, কোনো রাজনীতি-মনস্ক কবির আগে শামসুর রাহমানের কবিতাতেই প্রথম ভাষা বিদ্রোহের পতাকা উড়েছে। সম্ভবত নিজের অজ্ঞাতসারেই স্বসমাজ ও সংস্কৃতির জন্য একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের ভার পড়েছিল তাঁর ওপর। অথবা তিনি নিজেই তা নিয়েছিলেন বাংলাভাষা এবং কবিতার প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমের টানে।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে রক্তক্ষরণের দিনটির কিছু কাল পরেই তিনি লিখেছিলেন 'রূপালী স্নান' কবিতাটি। তখন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা কবিতায় অঘোষিতভাবে জল, ঈশ্বর ইত্যাদি বাংলা শব্দ ব্যবহার কার্যত নিষিদ্ধ। কারণ হিসেবে বলা হতো, এগুলো হিঁদুয়ানি বাংলা। শামসুর রাহমান এই নিষেধাজ্ঞা মানলেন না। তিনি তাঁর দীর্ঘ 'রূপালী স্নান' কবিতায় জল, ঈশ্বর শব্দগুলো চমৎকারভাবে বারবার ব্যবহার করলেন। তারপর কবিতাটি ছাপাতে দিলেন তখনকার একটি প্রতিষ্ঠিত দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীর পাতায়। সম্পাদক ঈশ্বর শব্দটি পরিবর্তন করার জন্য শামসুর রাহমানের ওপর চাপ দিলেন। কবিতাটি না ছেপে দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রাখলেন। শামসুর রাহমান এই চাপ অগ্রাহ্য করলেন, বললেন, আমি প্রয়োজনমতো আমার কবিতায় আল্লাহ, ঈশ্বর ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করব, যে শব্দ কবিতার রূপকল্প সৃষ্টির অনুকূল হবে সেই শব্দই আমি বেছে নেব। আমি অনুশাসন মেনে কবিতা লিখব কেন?

ফলে ওই পত্রিকায় কবিতাটি আর ছাপা হলো না। কবিতাটি বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার জন্যও শামসুর রাহমান কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসু সেটি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ছাপেন। অন্নদাশঙ্কর রায় এবং তার স্ত্রী লীলা রায় কবিতাটি পড়ে এত মুগ্ধ হন যে, লীলা রায় কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ ইংরেজিতে প্রকাশিত একটি আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনে ছাপা হয়। এরপর তার আরেকটি কবিতা 'মেফিস্তো ফিলিসের প্রতি ফাউস্ট' প্রকাশিত হলে সৈয়দ মুজতবা আলী এবং 'দেশ' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক সাগরময় ঘোষ দু'জনেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখেন।

বাংলাদেশে বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ত্রিশের আধুনিক বাংলা কবিতায় প্রায় লুপ্ত ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন শামসুর রাহমান। তাঁর আগে কবি আহসান হাবীব এবং আবুল হোসেন ছিলেন এই ধারার শক্তিমান কবি। কিন্তু ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের দেশে তথাকথিত মুসলমানী বাংলা প্রবর্তনের হুজুগে আশঙ্কা করা হচ্ছিল, বাংলা কবিতার হাজার বছরের ধারা মুছে ফেলে সম্ভবত একটি অদ্ভুত খিচুড়ি ভাষার কবিতা চর্চা শুরু হবে। 'অগত্যা' পত্রিকায় ব্যঙ্গ করে এই খিচুড়ি ভাষার একটা উদাহরণ দেখানো হয়েছিল। প্রাথমিক শিক্ষার 'আদর্শলিপিতে' একটি কবিতার দুই পঙ্‌ক্তি হলো– "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, প্রতিদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।" 'অগত্যা' পত্রিকায় 'তমদ্দুনি বাংলা ভাষায়' এই কবিতার ভার্সন ছাপানো হলো : "ফজরে উঠিয়া আমি দীলে দীলে বলি, হররোজ আমি যেন আচ্ছা হয়ে চলি।" এই ধরনের ভাষা প্রবর্তনের সরকারি-বেসরকারি চেষ্টা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালির মধ্যে তখন তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল।

শামসুর রাহমান এই ব্যাপারে জোটবদ্ধ হয়ে কোনো রাজনৈতিক ক্ষোভ দেখাননি। কিন্তু নিজের কবিতায় এককভাবে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। এজন্য আমি তাকে প্রাচীন পারস্যের মহাকবি ফেরদৌসীর সঙ্গে তুলনা করি। তিনি পারস্যে ইসলাম ধর্মকে স্বাগত জানিয়েছিলেন; কিন্তু সমৃদ্ধ ফার্সি ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর বহিরাগত আরবদের ভাষা-সংস্কৃতির আধিপত্য মানতে রাজি হননি। তাঁর নেতৃত্বেই ফার্সি ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় তখনকার পারসিক কবিরা সংঘবদ্ধ না হলে দেশটির ভাষা-সংস্কৃতি রক্ষা পেত না। বাংলাদেশে শামসুর রাহমান রাজনীতিকে তার কবিতায় মুখ্য উপজীব্য কখনো করেননি। কিন্তু কবিতার প্রতি দায়বদ্ধতাই সম্ভবত কবিতার প্রকৃত ভাষা ও আধুনিকতা রক্ষায় তাকে লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত রক্ষার আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত এমন একটি আন্দোলনও কি আছে, যেখানে শামসুর রাহমান নেই অথবা তাঁর কবিতা নেই? এমনকি এরশাদের আমলে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সবাইকে নিয়ে জাতীয় কবিতার মঞ্চ গড়ে তিনি কবিতাকে হাতিয়ার করেছেন। কিন্তু কবিতাকে তাঁর নিজস্ব ধর্মভ্রষ্ট হতে দেননি। কবিতাকে তিনি স্লোগান করেননি। বরং স্লোগানকে মহৎ কবিতায় ভাষা ও আবেগে রূপান্তর করেছেন। এখানেই সমসাময়িক কবিদের মধ্যে শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠত্ব।

যে কবি তাঁর কবিতার ভাষার প্রশ্নে প্রথম যৌবনে কোনো আপস করেননি, তিনি পরবর্তীকালে তাঁর কোনো কোনো কবিতায় উর্দু-ফার্সি শব্দ স্ব-ইচ্ছায় ব্যবহার করেছেন। তা দুরূহ উর্দু-ফার্সি শব্দ নয়; বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত উর্দু-ফার্সি শব্দ। এই শব্দ ব্যবহারের চমৎকার নিদর্শন রয়েছে তাঁর 'একটি মোনাজাতের খসড়া' এবং আরো কয়েকটি কবিতায়। তিনি বলেছেন, "ধর্মীয় ফতোয়া দ্বারা কবিতার ভাষা চয়ন বা নির্মাণ করা যায় না। কবিতার ভাষা হবে স্বতোৎসারিত। নিজের প্রয়োজনে সে যে কোনো ভাষা থেকে বোধগম্য শব্দ আহরণ করবে। তার মাথায় কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।"

আগেই বলেছি, শামসুর রাহমান কবিতায় একটি নিজস্ব প্রভাব-বলয় সৃষ্টি করেছিলেন। ত্রিশের কবিতার যুগকে অতিক্র ম করে তিনি নিজের একটি যুগও সৃষ্টি করে গেছেন। এটা উত্তর-আধুনিকতার যুগ নয়। আধুনিকতারই যুগ, যে যুগে শামসুর রাহমানের একজন সম্রাটের মতো অবস্থান। তাঁর মৃত্যুতে এই যুগটির অবসান হবে বলা চলে; কিন্তু বাংলা কবিতায় তাঁর অবস্থানের মহিমা ক্ষুণ্ন হবে না। সম্ভবত বাংলা কবিতায় উত্তর-আধুনিকতার যুগ শুরু হলেও নয়। কারণ, বাঙালির লোকায়ত ভাষা ও সংস্কৃতির এমন শেকড়ের সঙ্গে শামসুর রাহমানের জীবন ও কবিতা যুক্ত, যা থেকে তাকে ছিন্নমূল করা যাবে না। শামসুর রাহমান অমর এবং তাঁর কবিতা অবিনাশী।

লন্ডন, ১৮ আগস্ট, শুক্র বার, ২০০৬